রবিবার অনলাইন
আজকাল IN
26-11-2023

সলিল চৌধুরীর পাঁচটা রাজনৈতিক বছর

চয়ন ভট্টাচার্য

সাত বছর বয়সে জানতাম না সেই দুটি গান সলিল চৌধুরীর। কিন্তু ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার পিতৃদেবের বন্ধু সোনারপুর নিবাসী প্রণম্য শিল্পী সুরকার গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "সব কিছু ঠিক চলছে এ জীবন বেশ চলছে" এবং "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা "- শুনে বছর সাতেক বয়সেও শিহরিত হয়েছিলাম প্রধানত সলিল চৌধুরীর স্নেহধন্য গৌতমকাকুর বলিষ্ঠ কণ্ঠের দৃপ্ত গায়কীর কারণেই। কিন্তু বড়ো হতে হতে বুঝেছি এই দুটি গান আসলে স্রষ্টার কৃতিত্বেই সুরে ও কথায় সার্থক। এখনো মনে আছে আমাদের বৈষ্ণবঘাটা বাইলেনের বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় গৌতমকাকু "হেই সামালো হেই সামালো "গানটিও শুনিয়েছিলেন। অতএব সেই বাল্যবয়সে যে সলিল চৌধুরীকে আক্ষরিক অর্থেই গানে গানে চেনার সুযোগ হয়েছিল পরবর্তীকালে সুগম সঙ্গীত, গণসঙ্গীত সহ বিভিন্ন ছায়াছবির গানে তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণে মুগ্ধ হয়েছি। বিশেষত আমার মেজ জ্যাঠামশাই বাংলা গানের পুরোন দিনের সুপরিচিত যন্ত্রশিল্পী প্রয়াত ফণিভূষণ ভট্টাচার্য সলিল চৌধুরীর একাধিক জনপ্রিয় গানের রেকর্ডিংয়ে সহযোগিতা করেছেন বলে বেশ গর্বও ছিল। কিন্তু মুগ্ধতা ছাপিয়েও বাড়তি সম্ভ্রম জেগেছিল যখন জানতে পেরেছিলাম, চারের দশকের প্রথমভাগে কমিউনিস্ট পার্টির জনসভার মঞ্চে নেহাতই কলেজের ছাত্র সলিল চৌধুরীর নিজের বাঁধা গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ গণসঙ্গীতের আরেক কারিগর পরেশ ধর। যিনি পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে সলিল চৌধুরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও নাট্যশহীদ সফদার হাসমি ও সলিল চৌধুরীর প্রতি কখনো শ্রদ্ধাবোধ হারান নি। দায়িত্ববোধের কারণেই মনে করিয়ে দেওয়া জরুরি যে,"শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি "- গানের জন্য বেশি পরিচিত হলেও সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিদ্রোহের গান কবিতাটির সুরারোপ করেছিলেন পরেশ ধর। ঐতিহাসিক কারণেই বিনয় রায়,জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, নিবারণ পণ্ডিত,সাধন দাশগুপ্ত, গুরুদাস পাল,টগর অধিকারী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত পরেশ ধরও সলিল চৌধুরীর পূর্বসূরী। কিন্তু ষোল বছর বয়সে মিউনিসিপ্যালিটির সাফাইকর্মীদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার মাধ্যমে রাজনীতিতে হাতেখড়ির অভিজ্ঞতা কেবল সলিল চৌধুরীরই ছিল। আশুতোষ কলেজের ক্যান্টিনে আমাদের সিনিয়র পরবর্তীকালে ব্যাতিক্রমী ধারার কবি বিতান ভৌমিকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে নিয়মিত আড্ডা মারতে আসা দেবুদা অর্থাৎ দেবজ্যোতি মিশ্রের মুখে যে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সলিল চৌধুরীকে চিনতে শুরু করেছিলাম তাঁর তরুণ বয়স দক্ষিণ বারাসত জয়নগর চত্বরে প্রায় রাজনৈতিক কর্মীর মতোই শুরু হয়েছিল,দক্ষিণ চব্বিশ পরঘণা জেলার বাসিন্দা হিসাবে আমার মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। সেই কারণে ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকার প্রভাবের দিকটি তুলে ধরার জন্য একটি তথ্যচিত্র তৈরি করার প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছিলাম। মাসদুয়েক আগে আশৈশব সলিল চৌধুরীর সান্নিধ্যে থাকা গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনারপুরের মিশনপল্লীর বাড়িতে তাঁর ছাত্র সঙ্গীতগুণী বিপ্লব ঘোষ এবং রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তড়িৎ চক্রবর্তী ওরফে সাহেবদার সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে এই তথ্যচিত্রের কাজ শুরু করা গেছে। তড়িৎ চক্রবর্তী ওরফে সাহেবদা পরিকল্পনা শুনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন," আমার বাবা হরিধন চক্রবর্তী ই সলিল চৌধুরীকে চল্লিশের দশকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। যে কারণে সলিল চৌধুরী সবসময়ই অভিভাবকের মত শ্রদ্ধা করতেন। "

আমাদের জানাবোঝার পরিধিতে বাণিজ্যিক ছায়াছবি ও রেকর্ডের জগতে নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতের আর কোন সঙ্গীত স্রষ্টা নেই যিনি শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য ছদ্মবেশে এলাকার জনসমাবেশের মঞ্চে উঠে গান গেয়েছেন। তিনি সলিল চৌধুরী। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে তাঁর মামাবাড়ি। পড়াশোনা করতে আসাম থেকে আসার সুবাদে আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের কাছে দক্ষিণ বারাসত ও কোদালিয়ায় সলিল চৌধুরীর কৈশোরের কিছু সময় এবং যৌবনের প্রথমার্ধ কেটেছে। গানবাজনার চর্চার পাশাপাশি অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া এখান থেকেই। শুধু তাই নয়, যখন তাঁর সুরারোপিত দুটি কালজয়ী গান(যার মধ্যে কোন এক গাঁয়ের বঁধূ গানটির গীতিকবিতা তাঁর নিজের লেখা) রেকর্ডবন্দী হয়ে জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তখন তিনি আত্মগোপন করে রয়েছেন। আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় তখনকার কৃষক আন্দোলনের কর্মী হিসাবে পুলিশের হুলিয়া ছিল সলিল চৌধুরীর মাথার ওপর। হরিনাভী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়ার সময় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তৈরি হয়। গণনাট্যের সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শের প্রচারমূলক গান তিনি নিজে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে সৃষ্টি করতে পারতেন না। সলিল চৌধুরীর নিজের কথায়, "...প্রত্যক্ষভাবে যারা গণ আন্দোলনে জড়িত নন, গণ আন্দোলনকে যারা নিজের করে নিতে পারেন নি,গণসঙ্গীত তাদের কাছে তাত্ত্বিক কচকচি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মাঠে ময়দানে কলে কারখানায় বিভিন্ন গণ আন্দোলনের শরিক হিসাবে যে শিল্পীরা কাজ করেন,তাঁদের গলায় যে সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসে তা লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে হোক,পাশ্চাত্যসঙ্গীতের আঙ্গিকে হোক,তার বক্তব্যে,তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর সংগ্রামের(যে সংগ্রাম সে করছে) ছবি ফুটে ওঠে।" এত স্পষ্টভাবে আর কোন পেশাদার সঙ্গীতপরিচালক বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র ও রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ও নিজের বিশ্বাস এবং বোধ ব্যক্ত করতে পারেন নি। কেননা, সলিল চৌধুরীর এই বক্তব্য আমরা শুনছি ১৯৮৬ সালের জুন মাসে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে এক কর্মশালায়। মুম্বাইয়ের পাট তখন তিনি প্রায় চুকিয়ে দিয়ে কলকাতার বাসিন্দা। রেকর্ড করছেন,ছায়াছবির গানে সুর করছেন আবার স্ত্রী সবিতা চৌধুরী,কন্যা অন্তরা চৌধুরীকে নিয়ে খোলা মঞ্চে গণসঙ্গীতও গাইছেন। মৃণাল সেন লিখেছেন,তেভাগা আন্দোলনকে নিয়ে ছবি করার জন্য কৃষক আন্দোলন চলাকালীন তিনি,ঋত্বিক ঘটক ও সলিল চৌধুরী কাকদ্বীপে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সলিল চৌধুরী নিয়েছিলেন গল্প লেখার দায়িত্ব এবং ঋত্বিক ঘটক যোগাড় করেছিলেন একটি১৬ মিলিমিটার ক্যামেরা; যেটা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি ক্যামেরার খুঁটিনাটি অনেকটাই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। সেই চলচ্চিত্র তৈরি না হলেও ১৯৪৭ সালের জুন মাসে পূর্ববঙ্গ ও অসম সফরে বিনয় রায়ের নেতৃত্বে যে ১৪ -১৫ জনের দল শহিদের ডাক নামে একটি আলেখ্য পরিবেশনাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছিল সেই দলে সলিল চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, শম্ভু ভট্টাচার্য রেবা ও সজল রায়চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন। "শহিদের ডাক" ছিল একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং দেশভাগকে স্বীকার না করতে পারার যন্ত্রণাকে তুলে ধরার মাধ্যম। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন তাঁর বাল্যকালে এক বিকেলে ফিসফাস প্রচার ছড়িয়ে গেছে সোনারপুরের রাজনৈতিক সভায় গান গাইতে আসবেন সলিল চৌধুরী। পুলিশ ওত পেতে ছিল,এমনকি ভিড়ের মধ্যে শাদা পোশাকে মিশেও। বক্তৃতার ফাঁকে এক বাউল এসে খোলা গলায় গান গেয়ে জনতাকে মাতিয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল । সভা শেষে জানা গেল বাউলের ছদ্মবেশে সলিল চৌধুরীই এসেছিলেন।" আমার ঠাকুরমা সলিল চৌধুরীকে বলতেন তুমি তো কেষ্ট ঠাকুরের মতোই বাঁশি বাজাও!" গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন। "আমাদের সঙ্গে বাবার সূত্রেই সলিলদার পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। আমার পিসিকে গান তুলিয়ে দেওয়ার সময়ই দেখেছিলাম সলিলদা কত ভালো হারমোনিয়ম বাজান।"

চিত্রগ্রহণের শুরুতেই বিপ্লব ঘোষের কণ্ঠে সলিল চৌধুরীর সৃষ্টি "দেশ ভেসেছে বানের জলে / ধান গিয়েছে মর! কেমনি কহিব বন্ধু মনের কথা তোরে। " শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল সলিল চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁর অন্যতম পূর্বসূরী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ক্ষোভের বোধহয় একটা সঙ্গত কারণ ছিল। তেভাগা আন্দোলন,নৌ বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে সলিল চৌধুরীর গান ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়েছিল সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও আজ থেকে সত্তর বছর আগে গণসঙ্গীতের কয়েকটি ধারা নিবন্ধে হেমাঙ্গ বিশ্বাস অভিযোগ করেছিলেন, লৌকিক সুরের ওপর তৈরি সলিল চৌধুরীর ব্যঙ্গাত্মক গান "নাকের বদলে নরুন পেলাম " বা বাংলার পল্লীর কথকতার ধরণে "কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা " র মত গান তৈরি করেও সুরের কারিগরির দিকে বেশি মনযোগ দেওয়ার কারণে তাঁর সৃষ্ট অনেক গান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রোতার কাছে প্রবল আকর্ষণীয় হলেও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে সেই গানগুলো জনপ্রিয় হতে পারেনি। সম্ভবত হেমাঙ্গ বিশ্বাস জানতেন, যে সলিল চৌধুরী ধিতাং ধিতাং বোলে র মতন গান বাঁধেন বা "তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি "-র সুরে চোখ ভিজিয়ে দিতে পারেন - তিনি বাংলার গ্রামের কৃষক বা কারখানার শ্রমিকের মুখে মুখে ফেরা র মতো গান লোকায়ত সুর ভেঙেই করতে পারেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করতেন বিভিন্ন রাজ্যের লোকগান,পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে বাংলা গানে সলিল চৌধুরীর পরীক্ষা নিরীক্ষায় বাংলা আধুনিক গান সমৃদ্ধ হলেও গণসঙ্গীতের ধারা শক্তি অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এই হেমাঙ্গ বিশ্বাসই মুগ্ধ হয়েছিলেন,'সলিল চৌধুরীর কণ্ঠে "ঢেউ উঠছে কারা টুটছে ' শুনে।

আমার ভ্রাতৃপ্রতিম সুদীপ্ত পালের সঙ্গে ক্যামেরায় চোখ রেখে অবাক হয়ে দেখছিলাম তোমার বুকের খুনের চিহ্ন খুঁজি গাইতে গাইতে সাতাশি বছরের বৃদ্ধ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে আশ্চর্য দীপ্তি ফুটে উঠছে। বিপ্লব ঘোষের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গাইছেন কিন্তু তাঁর ভরাট বলিষ্ঠ কণ্ঠ আলাদা মাত্রা এনে দিচ্ছে। "কাট" বলার পরে ই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনার বয়সটা হঠাৎই যেন কমে গেল গৌতম কাকু!" হেসে উত্তর দিলেন, "সলিলদার গান গাইতে গেলে এখনো মনে হয় অনেক মানুষ কে শোনাচ্ছি।" পাশ থেকে তড়িৎ চক্রবর্তী বললেন "শেষ লাইনটা একজন রাজনৈতিক কর্মী ছাড়া লেখা সম্ভব নয়,"তোমার খুনে রাঙা পথের দাগে সবাই যাই যেন একসাথে।" মনে পড়ল কলকাতা দূরদর্শনের পর্দায় শাদা কালো রেকর্ডিংয়ে সম্প্রচারিত সন্ধ্যা সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়,সবিতা চৌধুরী এবং প্রবীর মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সলিল চৌধুরী গাইছেন ঢেউ উঠছে কারা টুটছে র অন্তরা" আজ হরতাল আজ চাকা বনধ!" ১৯৪৬ সালের ১৯শে জুলাই শুরু হওয়া ব্যপক কৃষক শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট এই গান। তার কয়েক মাস আগে ১৮ ই ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে নৌ বিদ্রোহ নিয়েই উৎপল দত্তের কালজয়ী সৃষ্টি "কল্লোল!" বিদ্রোহ বিক্ষোভ এভাবেই যুগে যুগে সলিল চৌধুরী উৎপল দত্তদের তৈরি করে।

নাঃ! এই তথ্যচিত্রটি আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করতেই হবে।

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN
26-11-2023

সিসিফাসের জার্নাল-২
ব্রেশট- ১২৫ এ আমাদের থিয়েটার

অভি চক্রবর্তী

১

হ্যাঁ শেষপর্যন্ত ক্ষমতাই সুন্দর। সে জন্মগতভাবে কতোটা গৌরবর্ণ বা উজ্জ্বল, কতোটা বেঁটে বা লম্বা, কতোটা কাপুরুষ বা পরশ্রীকাতর অথবা কতোটা শিক্ষিত কিংবা মেধাবী তা দিয়ে ক্ষমতাকে মাপেনা সাধারণ মানুষ। ক্ষমতা আসলে ভক্তি চায়, পুজো চায়, সে জানে পুজো আদায় করতে গেলে কী কী করতে হয়। আর আমরা জনগনমন তাদেরকে সর্বস্ব দিয়ে পুজো করতে তৎপর হয়ে উঠি। ক্ষমতা জানে ভয় দেখিয়ে ভক্তি বা ভালোবাসা আদায় করবার কৌশল। ক্ষমতা জানে ভালোবাসাকেও বিচ্ছিন্ন করবার নানান কায়দা। ক্ষমতার সামনে, ক্ষমতার চোখরাঙানির সামনে অসহায় হয়ে চোখের জল ফেলা ছাড়া, গোপনে গোপনে পুড়ে মরে যাওয়া ছাড়া কিচ্ছু করবার থাকেনা মানুষের। একটা লোক সর্বসমক্ষে খুন, রাহাজানি, বাটপারি, অস্ত্রব্যবসার মতো অপরাধ করেও নির্দ্বিধায় ভাষণে বলে যে সেই নাকি এই অঞ্চলের নায়ক, রূপকার। যাকে মেরেছে সেই নাকি তাকে ভরসা করে সমস্ত কিছু তার জিম্মায় রাখতে বলেছে। এভাবেই ক্রমাগত মিথ্যের মহাপ্রচারের সৌধ গড়ে তোলে শাষক। মিথের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা সত্যি হয়ে ওঠে, তার আশপাশে জন্ম নেয় সাগরেদ...সে দখল নেয়, অধিপতি হয়ে ওঠে।

২

How Much Is Your Iron এ ব্রেখটের মূল নাটককে সূত্র হিসেবে নিয়ে আমি এই অধিপতিদের কাহিনী বর্ণনা করতে চেয়েছি, এই নাটক ব্রেখট লিখেছিলেন ১৯৩৯ সালে। তখন তিনি সুইডেনে নির্বাসিতের জীবন কাটাচ্ছেন। তখন আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সেই নাটকে দ্যাখা যায় লোহা ব্যবসায়ী সেনসনের (সুইডেন) দোকানে বারবার হানা দিচ্ছে এক ভিনজাতির খদ্দের (জার্মান), সে প্রচুর লোহা কিনতে চায়। প্রতিবেশী সিগার ব্যবসায়ী হের অস্ট্রিয়ান (অস্ট্রিয়া) এবং জুতোর দোকানদার ফ্রাউ চেক (চেকোস্লোভাকিয়া) এই নিষ্ঠুর খদ্দেরের হাতে নিহত হয়। কিন্তু সেনসনের এতে কিছুই যেন যায় আসেনা, সে লোহা বিক্রি করেই চলে। সেই লোহা দিয়ে কী তৈরি হচ্ছে তা নিয়ে ভাবিত নয় সেনসন। ফলত সে হের ব্রিটের (গ্রেট ব্রিটেন) এর সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়না। অবশেষে সে নিজেই আক্রান্ত হয় সেই গ্যাংস্টারের মাধ্যমে।

আমি এই নাটককে একেবারে আমার সময়ের গরম চাটুতে এনে ফেলেছি। ভেজেছি বেশ করে। তা কতোখানি শিল্পীত হয়েছে আমি জানিনা কিন্তু আমি সত্যের, নির্মম একলা সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছি। ছাই হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে জেনেও এই চেষ্টার মধ্যে গিয়ে সমগ্র দল নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছি। জানিনা ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করে আছে আমার, আমাদের জন্য। এ সময় চূড়ান্ত বিচ্ছেদপ্রবণ, কুয়াশানগরীর মতো আধো-অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অবশ্যই অপরাধের সামাজিকীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অপরাধকে মেনে নেবার সময় ফলত শাষকের সামনে আত্মসমর্পণ ব্যাতীত আদৌ কি কিছু করবার আছে আমাদের? কতোটা শক্তিকে একত্র করে লড়তে পারব আমরা? জানা নেই। তাই ছদ্মবেশী শাষক মানে আমার রূপান্তরিত নাটকের খদ্দের পরিস্কার লাভ জেহাদের হুমকি দ্যায় ইনসান ও প্রজ্ঞাকে, আলাদা করে দিতে চায় দুটো মনকে, ধর্মের বারফট্টাই দিয়ে। আবার লোহা কিনে কিনে অস্ত্রাগার বানায়। কোথায় চলেছি আমরা?

৩

‘ভয় নিয়েই তো বাঁচতে হবে আমাদের বিশুদ্ধ ভয়...’

সামান্য লোহা কেনাবেঁচা করতে করতে আমার নাটকের পুরোহিতের ছদ্মে আসা ভিরু খদ্দের হয়ে উঠবে এলাকার ডন। নিয়ন্ত্রক। হতে পারে সেই এলাকা ডক, হতে পারে সেই এলাকা বর্ডার, হতে পারে সেই এলাকা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল বা কমনরুম। মোটকথা অঞ্চলের সামগ্রিক দখল নেবার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ নেবে সে। কোনো আবডাল রেখে নয়। প্রাথমিক ছদ্মবেশ খুলে রেখে সে নগ্ন ঈর্ষার মতো, হিংস্র উল্লাসের মতো, স্নেহশীল রেপিস্টের মতো সরাসরি ঘরে ঢুকে আসবে আপনার। সে এলাকায় ঢুকে শুরু করে দেবে ধ্বংসের আরতি। বেঁচুবাবুর লোহা বিক্রির লোভ তাকে উন্মাদ করে দেবে। তিনি বুঝবেনেও না এই লোহা দিয়ে সে কী বানায়? শেষে বেঁচুবাবুও আক্রান্ত হবেন, ততোক্ষণে আমরা এক ডিসটোপিয়া থেকে আরেক ডিসটোপিয়ায় যেতে যেতে আমরা শুধু ক্ষমতাপ্রবণ হয়ে উঠতে দেখবো কিছু নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িক উন্মাদকে। হয়তো এমন দিনের নিকটে, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। যেখানে শিল্পসম্মত করে আপনি বা আমি আমাদের প্রতিবাদকে প্রকাশ করতে পারছি কীনা সেটা আর ততোটা গুরুত্বপূর্ণ থাকবেনা। সত্যি কথা বলবার ছোট-বড়ো সমস্ত স্পেসকে কাজে লাগিয়ে কথা বলতে হবে আমাদের।

এখন শুধু ফলো করতে হবে। এক ভাষা, এক রাষ্ট্রের নিদানের দিকে হেঁটে যেতে হবে স্লোগান দিতে দিতে। সমস্ত স্লোগানই এখন রাষ্ট্রের পক্ষে, ব্যবসায়ীয় পক্ষে। আমাদের সবটা কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে। ভয়ের ভাইরাস ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। আক্রান্ত হয়ে আছি আমরা। হাত কচলে লাইনে দাঁড়াচ্ছি। নতমস্তকে সমর্পণ করছি নিজেদের। রাতে ক্লান্ত সোনাগাছির মতো ঘরে ঘরে উৎকট উল্লাসের আওয়াজে সম্পত্তি তৈরির জন্য বিকিয়ে দিচ্ছি নিজেদের।

‘সবাই পন্য সেজে কাকেই কিনবে কে যে গোটা দেশ জুড়ে সোনাগাছি।’

৪

আমাদের সময় নিয়ে পদ্য
বার্টোল্ট ব্রেশট

আমরা সকলে বেঁচে আছি কুক্ষণে
স্বাধীনতা আর শক্তি প্রদর্শনে।
যতো ছোট হই চাই তবু স্বাধীনতা
নিজস্ব এক নিবিড় নির্জনতা।

জ্ঞান আর মেধা নয় সবচেয়ে বড়
তার চেয়ে দামি হাত, শক্তি বা ধড়-ও।
কবিতা এবং কৌতুক অবশেষে
কঠিন সময়ে বেমালুম গেছে ফেঁসে।
মানুষ যদিও মজাটুকু লুটবেই
কিন্তু গতর নাড়বে না কিছুতেই
চাইছে সবাই, বেড়ে রাখা ভাতটাও
সম্ভব হলে মুখে গিয়ে গুঁজে দাও।

মনোযোগ দিয়ে আগে পড়া
হত বড় মানুষের
জীবন কথা
মহামানবের জীবনী আস্ত
সকলের মনে সহজে তাদের কাহিনি ভাসত
আজ পড়া হয় ধুম্-ধাম্ করে তাজা রোটসিল্ড
পড়া হয় শুধু রকফেলার আর ভাণ্ডারবিল্ড।
যদি কাউকেও জিজ্ঞেস করো, শীলার পড়েছ কি:
তার থেকে জ্ঞান অর্জন কিছু ঘটেছে কি এক
তিল-ও;
সে বলবে: ধ্যুৎ, শীলার পড়ব ছিঃ!
সে ছিল গবেট! তাকে পড়া বোকামি
ও কি জ্ঞানে-জ্ঞানে বড়লোক বনেছিল?

কুটিল সময় আর নেই হে মস্তানদের সাথে
এখন সময় বণিক এবং ব্যবসায়ীদের হাতে।

এইসব সময়ে বার্টোল্ট ব্রেশট ছাড়া আমাদের কোনো আশ্রয় নেই। কোনো নিরাময় নেই। আমাদের নাট্যে বেচুবাবুর ভূমিকায় অভূতপূর্ব অভিনয় করেছেন অরূপ গোস্বামী আর খদ্দেরের ভূমিকায় যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন স্বাগতম হালদার। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে হিমি শর্মা, দীপ্তসী সাহা, পায়েল ঘোষ, ঝুমুর ঘোষ, অসীম দাস, সৌমেন্দু হালদার, সুকান্ত পাল, গৌতম বসু উল্লেখযোগ্য। আসলে থিয়েটার বরাবর সময়ের কথা বলবার জন্য সিসিফাসের আজ্ঞাপ্রাপ্ত। তাই ব্রেশটের ১২৫ উপলক্ষে আমাদের এই নিবেদন।

‘আমরা দন্ডিত হয়ে জীবনের
শোভা দেখে যাই।
চারিদিকে মহাপুরুষের উক্তি
কোলাহল করে।’

যদিও এই উৎকট হল্লার মাঝে, কুৎসার রাজনীতির মাঝে এর একটি অংশ আমরা ২০১৮ সালে করেছিলাম। মনে রাখতে হবে, সময় যতো নিষ্ঠুর হচ্ছে বাংলার নাটককার ব্রেশট ততো প্রাসঙ্গিক হচ্ছেন। এসময়ে বাংলায় কমবেশি প্রায় দশটি নাটক অভিনীত হচ্ছে। সবাইকে আমি প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাই। আমরা আসলে সকলে মিলে একটাই কথা বলতে চাইছি, ক্ষমতার বিরুদ্ধস্বরকে প্রবল করতে চাইছি। আসুন আপিনও এই লাইনে দাঁড়ান।পরিচয়পত্রের মধ্যে লিঙ্ক করতে বা পুরনো টাকা ফেরতের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের রাষ্ট্র তাই আমাদের হাতে লাইন দেবার সময় কমে গ্যাছে। সৎ মিছিলের সময় কমে গ্যাছে। এও এক কৌশল আপনি চিনে নিন। আমাদের থিয়েটার এই চিনিয়ে দেবার কাজ করবে। করছে।

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN
26-11-2023

লিটিল ম্যাগ

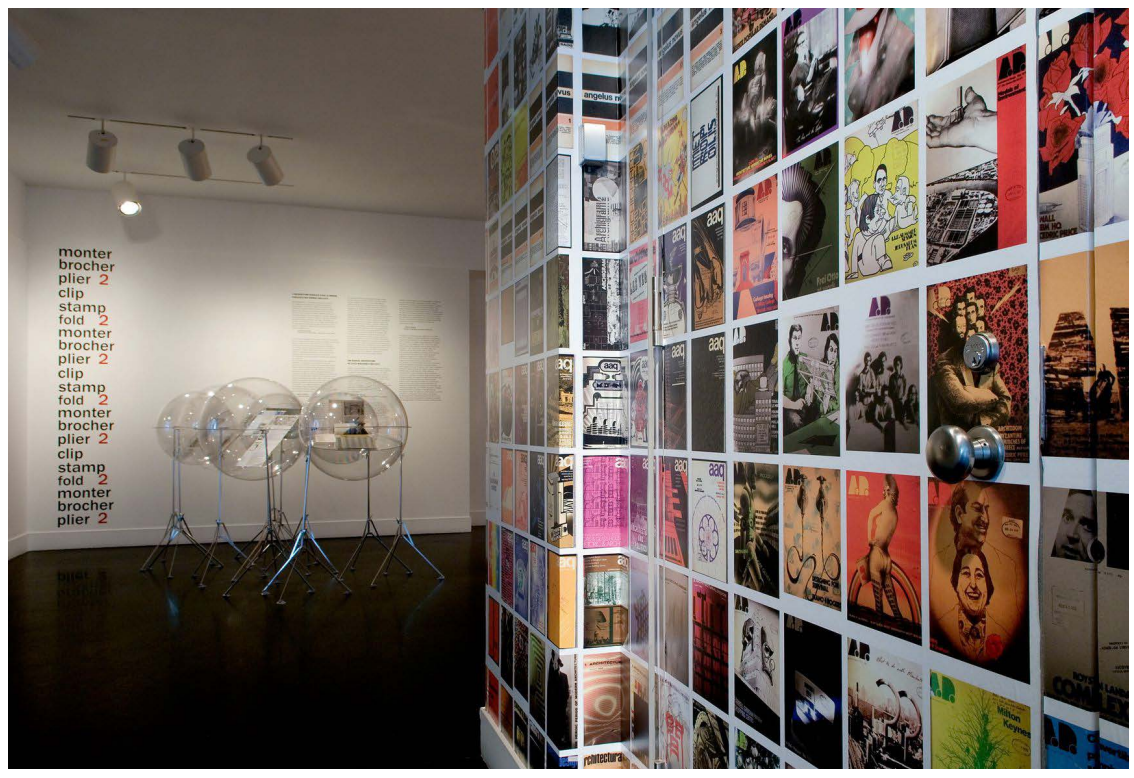

অপূর্ব নায়েক

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন অশোকতরু। ফাইনাল প্রুফের কপিগুলোকে রোল করে
বেঁধে টেবিলের একপাশে রেখে দিলেন। কাল সুভাষদাকে পৌঁছে দিতে হবে। ‘সোনালি
প্রিন্টার্স’-এর মালিক সুভাষদা। কাজটা ভালো বোঝেন। যত্ন নিয়ে করেন।
লেখকরা যদি একটু যত্ন নিয়ে ভাষাটা লিখতেন খুব ভালো হত। প্রুফে ভুল কম
আসত। কাজও অনেক কমে যেত। এমন সব বানান লেখেন ভাবতেও অবাক লাগে।
অশোকতরু মনে করেন, যে ভাষা আত্মপ্রকাশের ভাবপ্রকাশের মাধ্যম, তাকে
অনাদর করা নিজের সৃষ্টিকেই অবহেলা করা। একবার তিনি কয়েকজন গল্পকারকে
নিজেদের গল্পের প্রুফ দেখতে দিয়েছিলেন। মোট তিনবার প্রুফ দেখা হয়। ফাইনাল
প্রুফ দেখতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ অশোকতরুর। প্রুফের পাশে পাণ্ডুলিপি রাখলেন।
দেখলেন প্রুফ মোটামুটি ঠিকই দেখেছেন সবাই। আসলে পাণ্ডুলিপিতেই ভুল আছে।
আর কখনও তিনি কাউকে প্রুফ দেখতে দেননি। নিজেই দেখেন।
দুজন সিনসিয়ার ছেলেমেয়ে আছে। অশোকতরু কেবল তাদের উপর ভরসা করেন।
মল্লিকা আর অর্ক। লেখেও ভালো। প্রমিশিং। অন্যদের উপর ভরসা করা যায় না।
পাঁচজনের একটা কোর কমিটি আছে। সেখানেই সব সিদ্ধান্ত হয়। অশোকতরুকেই
ম্যাগাজিনের সিংহভাগ কাজ করতে হয়। টাকা-পয়সার দিকটাও সামলাতে হয়।
ট্যাঁকের টাকাই খসে অশোকতরুর। বিজ্ঞাপন বিশেষ পান না। আর কোনো সংখ্যার
জন্যে এক-দুটো পেলেও টাকার পরিমাণ উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। এমনি করেই
দশটা বছর টেনে নিয়ে চলেছেন তিনি। মাঝে মাঝে ভাবেন পত্রিকা বন্ধ করে দেবেন।
ঘরের টাকা দিয়ে আর কত দিন বের করা যায় ! বছরে ছ-টা সংখ্যা। পাঁচটা সংখ্যা
তিন ফর্মার। পুজো সংখ্যা ছ ফর্মার। সাধারণ সংখ্যা দেড়শ কপি ছাপান। পুজো
সংখ্যা দুশ কপি ছাপানো হয়। খরচ তো কম নয়। পত্রিকা বিক্রি করে খরচ কখনও
ওঠেনি। বেশিটাই পুশিং সেল করতে হয়। কবি লেখকদের সৌজন্য কপি দিতে হয়।
তাঁদের চাওয়াটাও সংগত। অথচ প্রত্যেকে যদি দু-একটা করে কিনতেন, তাহলে
পত্রিকার আর্থিক দিকটা একটু হলেও পুষ্ট হত। এদিকে বাণিজ্যিক মানসিকতা নেই
বলে পত্রিকার দাম ফেলা হয় শুধু খরচের হিসেবে। টাকা থাকলে পত্রিকাটাকে আরও
সাজিয়ে গুছিয়ে করা যেত।
অশোকতরুর ফোন বেজে উঠল। অশোকতরু বললেন, আমি তোমাকে ফোন
করেছিলাম।
অর্ক বলল, আমি ফোনটা ধরতে পারিনি। মিসড-কল দেখে ব্যাক করলাম।
ভালো করেছ। শোনো, কাল সুভাষদার কাছে প্রুফের কপি পৌঁছে দিতে হবে।
ঠিক আছে দাদা। হয়ে যাবে।
সুভাষদা কবে টেসিং দেবেন আমি ফোনে জেনে নেব। তবুও তুমি তাড়াতাড়ি
দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করবে। আমাদের পত্রিকা এবার মহালয়ার আগে বের
করতেই হবে। তুমি তো জান, মহালয়ার দিন পৌরসভার হলে পৌরপ্রধানের হাত দিয়ে

পত্রিকার উদ্‌বোধন করার সিদ্ধান্ত আমরা কোর কমিটিতে নিয়েছি। এটা আমাদের
দশ বছর পূর্তির উৎসবও বটে। অনেক মানিগুণী মানুষকে আমরা ডাকব। ফলে
পত্রিকাটা সুন্দর করতে হবে।
তার জন্যে আমরা প্রস্তুত দাদা। আপনি শুধু আমাদের নির্দেশ দেবেন।
প্রেস থেকে বেরিয়ে তুমি বাইন্ডিঙে যাবে। কাগজ আর লেবার ইত্যাদি নিয়ে
মোট খরচের একটা এস্টিমেট করে আনবে। আর জেনে আসবে কবে পত্রিকাটা আমরা
হাতে পাব।
ঠিক আছে দাদা। চিন্তা করবেন না।
অশোকতরু ফোন রেখে দিলেন। পাগলামি আর নেশা না থাকলে এতদিন ধরে
একটা লিটিল ম্যাগাজিন চালানো যায় না। কাজ কী কম ! লেখা জোগাড় করা পত্রিকা
চালানোর মৌলিক কাজ। তারপর ঝাড়াই-বাছাই আছে। সবচেয়ে বড়ো আর কঠিন কাজ
বিপণন। বছর তিনের ভেতরেই অশোকতরু একটা গোষ্ঠী তৈরি করতে পেরেছিলেন।
বেশির ভাগ লেখা এই গোষ্ঠীর লেখকদের কাছ থেকে পেয়ে যান। লেখা কম পড়লে
নিজে সব্যসাচী হয়ে কলম চালান। অন্যদেরও কিছু লেখা লিখে দিতে বলেন। তাঁর
পত্রিকার ট্যাগ-লাইন ‘আমরা স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাই’। পত্রিকার নাম একটা
বিশেষ লেটারিঙে বড়ো বড়ো করে লেখা হয়। তার তলাতেই থাকে ট্যাগ-লাইন।
অশোকতরু নিজেই প্রচ্ছদ আঁকেন। ছেলেবেলার আঁকাআঁকি কাজে লাগায় খুশি তিনি।
ফ্রন্ট পেজের ব্যাক সাইড বিজ্ঞাপনের জন্যে রাখেন। প্রথম পেজে সূচিপত্র।
পরের পেজে সম্পাদকীয়। তিন নম্বর পেজ থেকে কবিতা শুরু। কবিতার জন্যে ধার্য
আটটা পেজ। ছড়ার জন্যে চারটে। পরের কুড়িটা পেজ গল্পের জন্যে। প্রবন্ধের জন্যে
চারটে পেজ। সাধারণত একটার বেশি প্রবন্ধ ছাপা যায় না। পরের ছ-টা পেজ ‘আমার
শহর’। এটা এই পত্রিকার আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই মফস্‌সল শহরে
সাতাশটা ওয়ার্ড আছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের সুবিধা-অসুবিধা গুলো এখানে তুলে ধরা
হয়। বিষয় রাজনৈতিক অরাজনৈতিক যা খুশি হতে পারে। উদ্দেশ্য বিষয়গুলো
প্রশাসনের নজরে আনা এবং জনগণকে জানানো। দেখা গেছে, অনেক সমস্যার
সমাধান হয়েছে এই পত্রিকার ‘আমার শহর’ লেখার মাধ্যমে। সম্পাদক অশোকতরু
শিরদাঁড়া সোজা রেখে ‘আমার শহর’-এ কলম ধরেন এবং লেখা ছাপেন। কোনো দলকেই
রেয়াত করেন না। আবার ভালো কাজের প্রশংসাও করেন। দুটো পেজ ‘শিশু-কিশোর
বিভাগ’। এখানে ষোলো বছর বয়স অবধি বালক-বালিকারা যে-কোনো বিষয়ে লেখা
পাঠাতে পারে। লেখার সঙ্গে বয়সের প্রমাণপত্র দিতে হয়। বাকি দুটো পেজ
চিঠিপত্রের জন্যে। চিঠিপত্র কম এলে অথবা না এলে অন্য লেখা দিয়ে ভরাতে হয়।
ব্যাক-পেজের ভেতরে-বাইরে থাকে বিজ্ঞাপন। অবশ্য যদি পাওয়া যায়। সাধারণ
সংখ্যা এই ফরম্যাটে ছাপা হয়। পুজো সংখ্যার হিসেব আলাদা। অশোকতরু এই পত্রিকা
কয়েকটা লক্ষ্য নিয়ে প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি
চান এই শহরে লেখালেখির সুস্থ সাংস্কৃতিক একটা চর্চা চলুক। এই শহর থেকে
ভবিষ্যতের লেখক কবি নাট্যকার প্রাবন্ধিক উঠে আসুক। সমগ্র শহরে কোথায় কী
হচ্ছে, কী হল না, শহরবাসী একটা অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে জানুক। কিশোর-

কিশোরীদের ভাবনা ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই তিনি নাচার না হলে এই শহরের
বাইরের কারও লেখা ছাপান না। ইচ্ছে করলেই তিনি প্রতিষ্ঠিত গল্পকার কবি
প্রাবন্ধিকদের লেখা আনতে পারেন এবং ছাপাতে পারেন। তিনি তা করেন না।
প্রতিষ্ঠিতদের জন্যে অনেক কাগজ আছে। যারা সবে লিখতে শুরু করেছে তাদের
সুযোগ কে দেয় ? কোনো লেখককে দিয়ে একটা লেখা একাধিক বার লেখান
অশোকতরু। যতক্ষণ-না লেখাটা দাঁড়াচ্ছে। তবুও বাইরে থেকে লেখা আনেন না।
লেখা চাইতে গিয়ে অপমানিতও হতে হয়েছে তাঁকে। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা।
শহরের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সুরজিৎ সেনগুপ্ত। অশোকতরু একদিন তাঁর বাড়িতে
গেলেন। তিনি সুরজিৎ বাবুর হাতে পত্রিকার একটা সংখ্যা দিলেন। বললেন, আমরা
ক-জন মিলে এই পত্রিকাটা বের করছি। আপনি যদি পুজো সংখ্যার জন্যে আমাদের
একটা গল্প দেন, তাহলে খুব ভালো হয়।
সুরজিৎ বাবু বললেন, আপনি আমার লেখা পড়েছেন ?
আমি আপনার বেশ কয়েকটা গল্প বিভিন্ন ম্যাগাজিনে পড়েছি। খুব ভালো
লেগেছে। দুটো উপন্যাসও পড়েছি।
সুরজিৎ বাবু পত্রিকা উলটে পালটে দেখছিলেন। বললেন, এই পত্রিকায় দেখছি
নাম-করা কারও লেখা নেই। মানুষ এই ম্যাগাজিন কেনে ? মানে আমি বলতে চাইছি
লোকে পড়ে ?
অশোকতরু বললেন, লেখার গুণ কি নামে বাড়ে স্যার ? লিটিল ম্যাগাজিনে বাংলা
সাহিত্যের কত ভালো ভালো গল্প ছাপা হয়েছে সে তো আপনার অজানা নয়।
সুরজিৎ বাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। আশোকতরু বললেন, দেবেন স্যার একটা
লেখা আমাদের এই ছোট্ট পত্রিকাকে ?
সুরজিৎ বাবু বললেন, দেখুন, আমি লিটিল ম্যাগাজিনে লিখি না। তা ছাড়া
লিখতে শ্রম লাগে। পারিশ্রমিক ছাড়া আপনাদের কেন লেখা দেব ? কোথাও দিইও না।
এটা আমার নীতির প্রশ্ন।
এই বছর প্রথম অশোকতরুকে টাকার জন্যে চিন্তা করতে হচ্ছে না। যথেষ্ট
বিজ্ঞাপন পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পত্রিকা বৃহত্তর স্বীকৃতিও পেয়েছে।
সেদিনকার ফোনটা তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল।
আমি পৌরপ্রধান সুজন মুখার্জি বলছি।
আশোকতরু ভীষণ অবাক হলেন। বললেন, বলুন।
আমি আপনার ম্যাগাজিন পড়েছি। আমাদের এই ছোট্ট শহরে এত ভালো একটা
ম্যাগাজিন এত বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রতিটা লেখাই
জীবনধর্মী। আমি আপনার পত্রিকার শ্রী এবং স্বাস্থ্য প্রার্থনা করছি।
ধন্যবাদ স্যার।
আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল।
বলুন।

আমাদের পৌরসভার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রতি বছর গুণীজন সংবর্ধনা দিই
আমরা। এই শহরের নাগরিকেরা, যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শহরের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন
বা করে চলেছেন, আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই।
কাজের স্বীকৃতি দিই। এই বছর সেই তালিকায় আপনার নাম আমরা নথিভুক্ত করেছি।
আপনি যদি সম্মত হন, আমরা আপনার নাম আমাদের প্রচারপত্রে ছাপাব। যথা সময়ে
আপনার বাড়িতে আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়ে দেব। অনুষ্ঠানের দিন এসে আপনি শুধু মঞ্চ
উজ্জ্বল করে থাকবেন।
দু-চার কথা বলবেন।
অশোকবাবু বললেন, এ তো আনন্দের কথা। আমি সানন্দে সম্মতি জানালাম।
ধন্যবাদ।
পৌরপ্রধান ফোন কেটে দিলেন। পৌরপ্রধানের ছায়াসঙ্গী ডান হাত নগেন বলল, দাদা, এটা কী হল ? ওই
পত্রিকা তো আমাদের তুলোধোনা করে। শালা পিছনে কাঠি মেরেই চলেছে, মেরেই চলেছে। তাকে টিট্ না করে খাতির করে ডেকে এনে সংবর্ধনা দেবেন ?
পৌরপ্রধান মুচকি হেসে বললেন, ওরে সম্মাননীয়কে সম্মান দিতে হয়।
আপনি একবার বলুন না চমকে দিয়ে আসি। ম্যাগাজিন বের করা একেবারে গাঁ –
হাত তুলে অশ্রাব্য বাক্যকে থামিয়ে দিলেন পৌরপ্রধান।
নগেন বলল, কী জানি দাদা, আপনার লীলা বুঝতে পারি না।
পৌরপ্রধান কিছু বললেন না।
অশোকতরুর মতো সামান্য একজনকে কিস্তিমাত করার জন্যে বোড়ের একটা চালই তাঁর যথেষ্ট। ঘোড়া গজের দরকার নেই।
মঞ্চ প্রস্তুত। আমন্ত্রিতরা অনেকেই এসে গেছেন। হল মোটামুটি ভরতি।
কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হবে। আমন্ত্রিতদের মঞ্চে ডেকে নিচ্ছেন
ঘোষিকা। ঘোষিকা সুললিত কণ্ঠে বলল, এবার মঞ্চে আসার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি
আমাদের শহরের গর্ব প্রখ্যাত অধ্যাপক ‘স্বপ্ন’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রী
অশোকতরু বসু মহাশয়কে।
অশোকতরু মঞ্চে উঠে বসলেন। জেলাশাসক, এসডিও, বিডিও, এসপি, জেলা হাসপাতালের সুপার, সাংসদ, বিধায়ক, পৌরপ্রধান বসে আছেন। চাঁদের হাট।
পৌরপ্রধানের পাশের চেয়ারে বসলেন অশোকতরু। তাঁর পাশে এসে বসলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। অশোকতরুর সে দিনের অপমানের কথা মনে পড়ে গেল।
অশোকতরুকে ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করে নিল এক ফুটফুটে কিশোরী।
উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন জেলাশাসক। তাঁর হাতে শাল তুলে দিলেন এসপি সাহেব।
সাংসদ
তুলে দিলেন স্মারক, মানপত্র এবং ঝরনা কলম। ঘোষিকা মানপত্র পাঠ করল। হল করতালিতে মুখর হয়ে উঠল।
বিধায়ক ল্যাপটপ দিয়ে সম্মান জানালেন। পৌরপ্রধান মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, মাননীয় অশোকতরু মহাশয়কে সম্মান
জানাতে পেরে আমরা নিজেরা সম্মানীত বোধ করছি। আমি ওঁর পত্রিকার বিষয়ে আলোচনা করার ধৃষ্টতা দেখাব না। শুধু একটা ঘোষণা আছে। লিটিল ম্যাগাজিনের

সম্পাদককে অনেক অর্থকষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। আমরা পৌরসভার পক্ষ
থেকে তিরিশ হাজার টাকার একটা চেক তুলে দিচ্ছি অশোকতরু মহাশয়ের হাতে।
তিনি
যেন এটাকে অনুগ্রহ না ভাবেন। আমরা ওঁর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব। সেই বাবদ
অগ্রিম টাকা। বিজ্ঞাপনের ম্যাটার পরে দিয়ে দেব। আমি কথা দিচ্ছি সমস্ত রকম
সাহায্য নিয়ে আমরা এই পত্রিকার পাশে থাকব।
আবার হাততালির ঝড় উঠল। এবার বলতে উঠলেন সুরজিৎ বাবু। অশোকতরুর এবং পত্রিকার ভূয়সী
প্রশংসা করলেন। এমনও বললেন যে, এই জনপদে এমন উচ্চ মানের একটি পত্রিকা
দীর্ঘ দিন ধরে প্রকাশ হয়ে চলেছে, এ এই জনপদের সাংস্কৃতিক গর্ব। তিনি যদি এই
পত্রিকায় লেখার সুযোগ পান, সম্পাদক যদি তাঁর লেখা ছাপেন, তাহলে তিনি নিজেকে
ধন্য মনে করবেন।
অশোকতরু অবাক হয়ে সুরজিৎ বাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষ এমন করে
পালটি খায় ! বিশেষত যিনি লেখেন ! লোকটার কি আদর্শ বলে কিছু নেই !
অশোকতরু পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার একটা করে কপি মঞ্চে উপবিষ্ট
সবার হাতে তুলে দিলেন।
সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে পত্রিকার বিষয়ে তাঁর আগামী দিনের ভাবনার কথা বললেন অশোকতরু। সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জানালেন।
বিশেষ করে উল্লেখ করলেন পৌরপ্রধানের সহৃদয় সহযোগিতার কথা।
বাড়ি ফেরার সময় অশোকতরু যখন টোটোয় চেপে বসলেন, শহরটাকে তাঁর
অচেনা লাগল। আলো গুলোকে অত্যন্ত উজ্জ্বল মনে হল। বুকের ভেতরে খুশির ঝরনা
তোড়ে বয়ে চলেছে। অসংখ্য পাখির কলকাকলি তাঁকে অস্থির করে তুলছে।
অশোকতরুর মতো সামান্য একজন অধ্যাপককে এই শহরের ক-জন মানুষ চেনে ? পৌরসভার অনুষ্ঠান তাঁকে অনেকটা পরিচিতি দিয়েছে একদিনে। তিনি কি কখনও ওই সমস্ত মানুষদের পাশে বসতে পারতেন ? ওঁদের কাছে যেতে পারতেন ? পুজো সংখ্যায় সাংসদ বিধায়ক জেলাশাসকের ‘শুভেচ্ছা’ ছাপা হচ্ছে। এডিএম একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করেন। তিনি একটা গল্প দিয়েছেন। এগুলো তাঁর পত্রিকাকে শহরবাসীর কাছে আরও মর্যাদার করবে বলেই মনে করেন অশোকতরু। টাকার চিন্তাটাও আপাতত গেছে। অশোকতরু দরজা ঠেলে বললেন, আসতে পারি ?
আসুন।
পৌরপ্রধান বললেন, বসুন।
পৌরপ্রধান বেল টিপলেন। বেয়ারা এসে দাঁড়ালে তিনি বললেন, কফি।
বেয়ারা দরজা ঠেলে বেরোবার সময় একটা বাক্য বাইরে থেকে ভেসে এল,
কাগজের এডিটর। কেউ কাউকে বলছে। অশোকতরুর ভেতরটা আনন্দে ভরে গেল। তাহলে তাঁর একটা
আইডেনটিটি তৈরি হচ্ছে।
পৌরপ্রধান বললেন, আমরা আপাতত এই পত্রিকায় সামনের এক বছর
প্রতিটা সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। টাকার জন্যে ভাববেন না। এক বছর পর আবার
নতুন করে চুক্তি হবে।
বিজ্ঞাপনের ছ-টা ম্যাটার আপনি আজ নিয়ে যাবেন।

আচ্ছা।
কফি এল। সঙ্গে প্যাটিস।
কফিতে চুমুক দিয়ে পৌরপ্রধান বললেন, কয়েকটা
বই দোকানে বলে দেব। আপনি পত্রিকা রেখে আসবেন।
বিক্রি হবে ? বললেন আশোকতরু।
দেখা যাক না। পত্রিকার সার্কুলেসন বাড়াতে হবে তো না কি ?
বাড়ে আর কই ? কত কপিই তো পড়ে থাকে।
পুজো সংখ্যা আমার দপ্তরে পঞ্চাশ কপি দিয়ে যাবেন।
অশোকতরু ঠিক শুনছেন তো ? পঞ্চাশ কপি !
বাই দা বাই। আপনি সামনের রবিবার কি ব্যস্ত থাকবেন ?
না। ফাঁকা আছি। অশোকতরু বললেন।
পৌরপ্রধান কাউকে ফোনে ধরলেন। ও পাশ থেকে কী কথা বলছে অশোকতরু শুনতে পাচ্ছেন না। পৌরপ্রধান বললেন, আচ্ছা, আপনারা কি ‘স্বপ্ন’ পত্রিকার
সম্পাদক অধ্যাপক অশোকতরু বসুকে রক্তদান শিবিরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ?
জানাননি ? এই তো ভুল করেন। এমন সম্মাননীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদের সঙ্গে না নিতে পারলে সে তো আমাদেরই লজ্জা। কী বলছেন ? আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেবেন ? আপনি নিজে যাবেন ?
আচ্ছা বেশ বেশ, তাহলে তো খুব ভালোই হয়। রাখছি। পরে কথা হবে।
অশোকতরুকে পৌরপ্রধান বললেন, তাহলে রবিবার দেখা হচ্ছে। বেস্ট অফ
লাক।
অশোকতরু বললেন, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
না না, এটা আমার কর্তব্য।
অশোকতরু কৃতজ্ঞতায় ন্যুব্জ হয়ে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন।
বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নানা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন অশোকতরু।
মহালয়ার অনেক আগেই পত্রিকা ছাপা এবং বাঁধাই হয়ে চলে এল। পত্রিকার
সঙ্গে যুক্ত সবাই একবাক্যে স্বীকার করল সংখ্যাটা আগের সব সংখ্যার চেয়ে
আলাদা এবং সেরা হয়েছে।
প্রচ্ছদ সুন্দর। শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো হয়েছে। কাগজ ভালো। ছাপা ঝকঝকে। কোর কমিটির সবাই আন্তরিক ভাবে পরিশ্রম করেছে।
শুধু ‘আমার শহর’ পত্রিকা থেকে চির বিদায় নিয়েছে।

Apurba Nayek, Village – Ramkrishnapur, Post Office – Barasat, District – North 24 Parganas, Pin Number – 700124, Phone – 8981620687,

বইয়ের দুনিয়া
রবিবার অনলাইন
আজকাল IN
26-11-2023

ঢাকার হাতিরপুল

গৌতম রায়

হাতিরপুলের নীচে ছিল একটি রেললাইন। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের শেষ সময়ে ঐ স্থানে রেললাইন তৈরি করা হয়। এই পুল দিয়ে একসময় হাতি পারাপার হতো। হাতিদেরকে রেললাইনের উপরের পুল দিয়ে পিলখানা থেকে হাতিরঝিলে নিয়ে যাওয়া হতো গোসল করাতে। নুড়ি পাথর আর স্লিপারের কারণে রেললাইনের উপর দিয়ে হাতিরা হাঁটতে পারতো না। তাই তারা যেতো তৈরিকৃত উপরের পুল দিয়ে। আর সেই থেকেই এটির নাম হলো হাতিরপুল।

বর্তমানের গাউছিয়া মার্কেটের পাশ দিয়ে বাটা সিগনাল ক্রস হয়ে হাতিরপুল দিয়ে পরিবাগ হয়ে রমনা থানার পাশ দিয়ে মগবাজার ওয়্যারলেস মোড় পেরিয়ে মধুবাগের দিকে যে রাস্তাটি গেছে - এই পুরো রাস্তাটির নাম ছিল এলিফ্যান্ট রোড। এলিফ্যান্ট রোডেই ছিল শহিদ জননী জাহানারা ইমামের বাসা ছিল।এই পুরনো রাস্তার পাশে এখনো একটি পুরনো মসজিদ রয়েছে, যার বর্তমান নাম রমনা থানা মসজিদ। ব্রিটিশ লাইব্রেরীর পুরনো ছবিতে এই মসজিদটির দেখা মেলে।

ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় , আজকের জনবহুল এলিফ্যান্ট রোড এলাকাটি ১৮০০ সালে ছিলো বিশাল আকৃতির গাছ-গাছালিতে ঘেরা ছোটখাট বনাঞ্চল। পরবর্তীতে গাছ-পালা কেটে হাতি চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরি করা হয়। এই এলিফ্যান্ট রোড দিয়েই শত শত হাতির পাল চড়িয়ে বেড়াতেন মাহুতরা। পরবর্তীতে সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগ পর্যন্ত 'নিউ এলিফেন্ট রোড' নামের আড়ালে আদি এলিফেন্ট রোডের পরিচয়টি হারিয়ে গেছে।

বর্তমানে এলাকাটি হাতিরপুল নামেই পরিচিতি লাভ করে। তখন মানুষেরা এই পুল, হাতি আর ট্রেন দেখতে এখানে আসতো। পুলের নিচে এর নীচে কাছাকাছি অবস্থানে ছোট ছোট কয়েকটি খাবারের হোটেল ছিল। আর ছিলো ছোট্ট একটি বাজার। বাজার বলতে তখন রেল লাইনের উপর কয়েকটা অস্থায়ী দোকান। পঞ্চাশ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে বসতি গড়ে উঠতে শুরু করে। হাতিরপুল বাজার তখনও হয়নি। নূতন বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনে পুঁজি বিনিয়োগ করে কিছু লোককে এখানে বেচাকেনা করতে বলেন, সেখান থেকেই এ বাজারের গোড়াপত্তন। ১৯৬৯ থেকে ৭৪ পর্যন্ত পুলে ওঠার জন্য টাকা দিয়ে রিকশা ঠেলে দেয়ার জন্য লোক পাওয়া যেতো। এই পুল পারাপারের জন্য যে সব ছোট ছোট ছেলেরা ছিলো, তাদেরকে প্রতিবার পারাপারের জন্য দিতে হতো ২ থেকে ৩ আনা। এরা ৪/৫ জনে দলবেঁধে রিকশা ঠেলতো। এভাবে রিকশায় চেপে পুল পার হওয়া যেতো। এই পথেই ছিলো শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীদের পৈতৃক বাড়িটা। হালকা হলুদ রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটির নাম ছিল 'দারুল আফিয়া'। হাতিরপুল পার হয়ে যাতায়াত করতে হতো দারুল আফিয়ায়, শহীদ মুনীর চৌধুরীর বাড়িতে। ১৯৭১ সালে সেখান থেকেই তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল রাজাকাররা।

তৎকালীন রমনা এলাকার চারপাশে বেশ কিছু খাল ছিল। যেগুলো এখন মানচিত্র আর কাগজে-কলমে আছে, বাস্তবে নেই। হাতিগুলোকে নেওয়ার জন্য খালের উপর নির্মিত হয়েছিলো সেতু। এক সময় বর্তমানের প্রায় সীমান্ত স্কয়ার থেকে হাতিরঝিল হয়ে একদিকে গুলশান পর্যন্ত অন্যদিকে ডেমরা পর্যন্ত নৌ চলাচল পথ ছিল। এক সময় হাতিরপুল ভেঙ্গে নীচের লাইন বরাবর যে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয় সেই রাস্তার নাম রাখা হয়েছিলো পেনিট্রেটর রোড। কেন এমন একটা অদ্ভুত নাম রাখা হয়েছিল, আর কীভাবেই বা এলাকাটা হাতিরপুল বাজার হয়ে গেল জানা যায়নি। এখন যেখানে মোতালেব প্লাজা টাওয়ার গড়ে উঠেছে, সেখানে ছিল একটি সুইপার কলোনি। নাম ছিল 'মোতালেব কলোনি'। মোতালেব কলোনির মধ্যে পাঁচটি দোতলা বাড়ি ছিল। কাঁঠালবাগানের ঢালে পরিত্যক্ত রেললাইন ছিল।

ওপাশে ছিল পরীবাগ মসজিদ, ছিল পাওয়ার হাউসটাও। সেসময় হাতিরপুল সংলগ্ন পরিবাগ এলাকায় অনেক গাছগাছালি ও খাল ছিলো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা না-কি এই পুলের উপর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে গুলিবর্ষণ করেছিল। হাতিরপুলটি ছিল খাড়া এবং উঁচু যার ফলে দুর্ঘটনা লেগেই থাকতো।

১৯৭০ এর দশকে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় একটি সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল এই হাতিরপুল ভাঙা নিয়ে। রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে, ৫০ বছরের পুরোনো এই পুলটি ভাঙা হবে নগরে নতুন রাস্তা তৈরি করার জন্য। পৌরসভা এই পুল ভাঙ্গার কাজটি করছে। নতুন রাস্তা তৈরির জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা। ফুলবাড়িয়া-তেজগাঁও রেললাইনের উপর দিয়ে পরিবাগ ও ধানমন্ডি এলাকার মধ্যে যান চলাচলের সহজ উপায় ছিলো এই হাতিরপুল বা রেলওয়ে ওভার ব্রিজটি। নগর সংস্কারের জোয়ারে ও আকাশচুম্বি অট্টালিকা তৈরির জন্য এই পুলটি ভাঙ্গা হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিলো, 'যদিও এই পুলটি ঐতিহাসিক এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলো, কিন্তু সেসময়ের নগর পরিকল্পনাবিদরা বলেছিলেন রেলওয়ে স্টেশন কমলাপুরে সরিয়ে নেয়ার পর এই পুলের আর দরকার নাই।'

১৯৬০ দশকে হাতিরপুল ব্রিজের নীচে রেলগাড়ি চলাচল করতো, ১৯৬৯ এ ব্রিজটি ভেংগে ফেলা হয় নগর সম্প্রসারনের প্রয়োজনে, ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন সরিয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনে স্থানান্তরিত করা হয়।

এক সময় এ ই স্থান দিয়ে হাতি পারাপার হতো। পুলের নীচে ছিল একটি রেললাইন। হাতিরা রেললাইনের উপরের

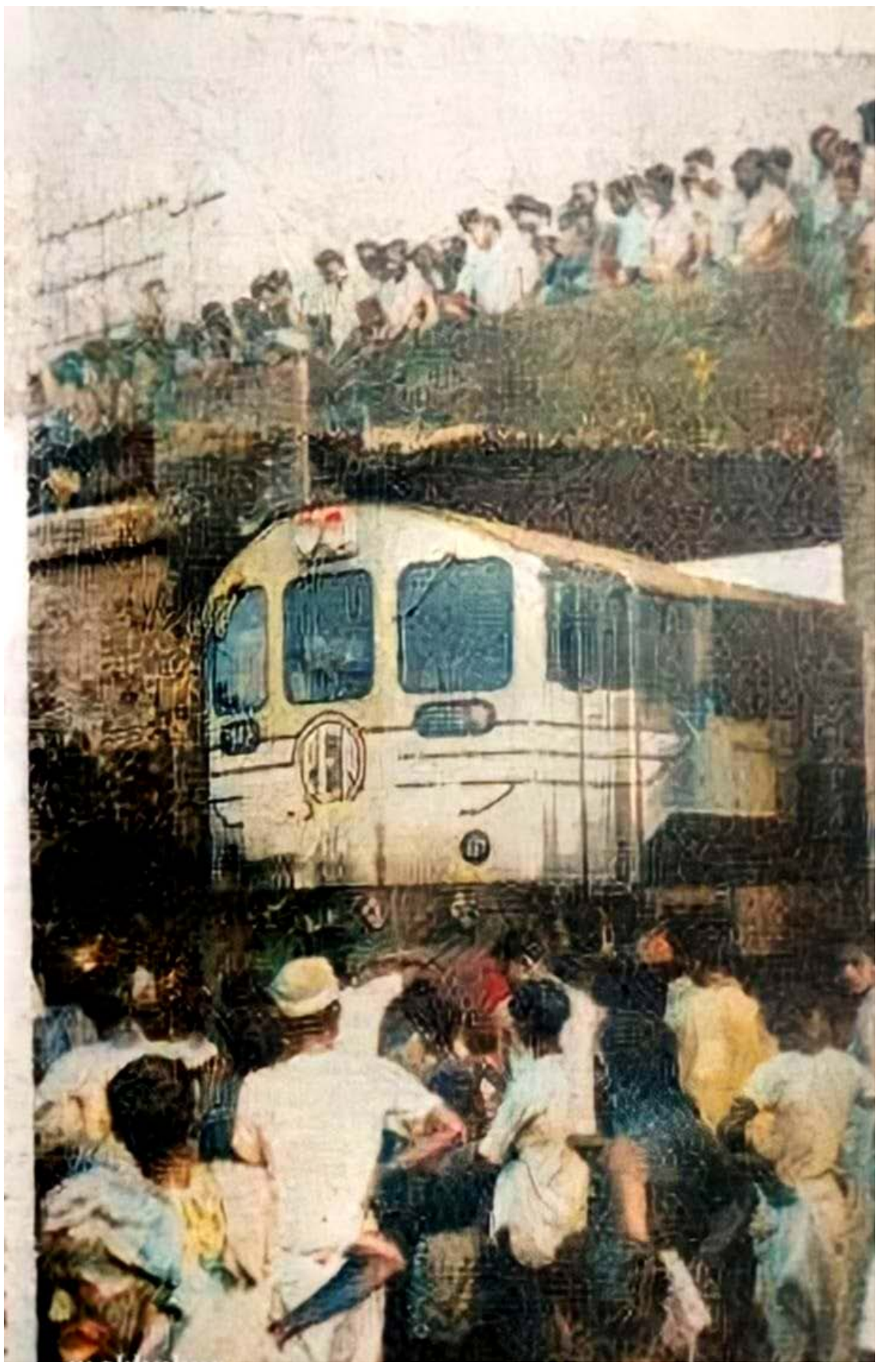

পুল দিয়ে পিলখানা থেকে হাতিরঝিলে যেতো গোসল করতে। নুড়ি পাথর ও রেললাইনের উপর দিয়ে হাতিরা নাকি হাঁটতে পারতোনা পায়ের নীচের নরম মাংসের কারণে। তাই তারা যেতো উপর দিয়ে। আর সেই থেকেই এর নাম হলো হাতিরপুল।

ইতিহাসে আছে একসময় মোঘল ও ইংরেজ আমলে ঢাকায় অনেক হাতি ছিল। যে রাস্তা দিয়ে নেয়া হতো সেটাই আজকের এলিফ্যান্ট রোড। রমনার চারপাশে বেশ কিছু খাল ছিল। হাতিগুলোকে নেওয়ার জন্য খালের উপর নির্মিত হয় সেতু। পিলখানা থেকে বর্তমান হাতিরপুল এলাকায় হাতি চলাচলের জন্য বর্তমানের ইস্টার্ন প্লাজা ও পরিবাগ বরাবর যে সেতু বা পাকা পুল নির্মাণ করা হয়েছিল হাতি পারাপারের জন্য, যা পরবর্তীতে হাতিরপুল নামে পরিচিতি লাভ করে।

চিত্র: ছবিটি ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে, দৈনিক অবজারভার পত্রিকা হতে নেওয়া, পত্রিকার শিরোনাম ছিল:
"A Dacca-bound train stops under the Hatir Pool Ele-phant Road bridge at 6 a.m. en Sept. 20-OBSERVER"

রবিবার অনলাইন
আজকাল IN
26-11-2023

ধারাবাহিক উপন্যাস (৯)

কুন্তীর বস্ত্রহরণ

হরিশংকর জলদাস

গত সপ্তাহের পর

তেইশ

কাঁকরি নদীর উপান্তে শ্মশানটি।

দু'কদম এগোলেই নদীজল। নদীজল ছুঁয়ে ঘাট। পাথুরে। ধাপে ধাপে জলপর্যন্ত নেমে গেছে। কুমোররা এমনিতে দরিদ্র মানুষ, কিন্তু ঘাটটি তৈরির ক্ষেত্রে কার্পণ্য করেনি। সবাই মিলে খেয়ে না খেয়ে শ্মশানঘাটটি মজবুত করেছে। ওই ঘাট বেয়ে কাঁকরির জল এনে মরদেহ স্নান করায় যে ওরা!

বহু বছরের পুরনো এই শ্মশানটি। চাঁপাতলার আদি কুমোরপাড়াটির বয়স যত, শ্মশানটির বয়সও তত। জন্ম আর মৃত্যু তো মনুষ্যসমাজের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। বহু বহু বছর আগে থেকে চাঁপাতলার কুমোররা এই শ্মশানে দাহকার্য সম্পন্ন করে আসছে। শুধু কুমোর কেন, মালোদের শ্মশানও এটি। আগে এই শ্মশানে মালোদের মরদেহ পোড়াতে দেওয়া হতো না। এতে কষ্টের সীমা ছিল না কৈবর্তদের। কখনো নদীপাড়ের খন্দে, কখনো জঙ্গলের ঘুপচিতে মড়া পোড়াত। পরে অজয় জেঠার মধ্যস্থতায় মালোরা এই শ্মশানে শব পোড়ানোর সুযোগ পেয়েছে।

বিশাল জায়গা জুড়ে শ্মশানটি। বড় সুন্দর জায়গা। দিনে দিনে কঠোর পরিশ্রম করে কুমোররা কাঁকরির মাটি এনে এনে শবদাহের জায়গাটি ভরাট করেছে। নানা ধরনের গাছ শ্মশান জুড়ে। দামি দামি। মেহগনি, চাঁপালিশ, শিরীষ গাছ তো আছেই, সেগুন গাছই বেশি। বহু বছর বয়স গাছগুলোর। শ্মশানের সমস্ত গাছের দাম বর্তমান বাজারমূল্যে কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ওই জায়গায় একটা বাগানবাড়ি করবে। বিপুল গাছপালার মাঝখানে বাড়ি বানাবে একটা। ইটের। দোতলা। দ্বিতীয় তলাটা হবে চৌচালা। পুরনোদিনের কুঁড়ের মতো। সাম চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের খায়েশ হয়েছেনে বিরাট বাগান। চারদিকের আঙিনায় থাকবে নরম ঘাস। পা ফেললে যাতে কার্পেটের আরাম পাওয়া যায়। একটা পুকুরও কাটাবে আবুল কাশেম। পড়ন্ত বিকেলে পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে বসে তসবি ঘোরাতে ঘোরাতে স্বচ্ছ পানিতে মাছেদের খেলা দেখার বড় সাধ আবুল কাশেমের।

শিশুকালটা বড় কষ্টে কেটেছে আবুল কাশেমের। বাপ ছিল দিনমজুর। সময়মতো ঘরে ছন দিতে পারত না। বর্ষায় চালের ফুটো দিয়ে টুপটাপ পানি পড়ত। গোটাটা রাত নড়ে নড়ে শুতে হতো। বৃষ্টি খুব কষ্ট দিয়েছে আবুল কাশেমদের। এবার বৃষ্টিকে কষ্ট দেবে সে। বাগানবাড়ির দোতলায় হেলান-চেয়ারে বসে থাকবে সে। পাশের ছোট্ট টুলটিতে থাকবে চা-ভরতি কাপ। কাশেম সেই কাপে একটু একটু চুমুক দেবে আর বৃষ্টিপড়া দেখবে। বৃষ্টির কণা এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। সে সেই বৃষ্টিরকণাকে লাথি মারবে। লাথি মেরে মেরে জিজ্ঞেস করবে, 'হারামজাদা বৃষ্টি, একসময় খুব জ্বালাইছিলি তুই আমারে! বর্ষায় ঘরে আরাম কইরে থাইকতে দেস নাই। অহন বুঝ, লাথি খাইতে কেমন লাগে দ্যাখ।'

ভাবতে ভাবতে বিভোর হয় আবুল কাশেম। ফখরে আলমকে মনের গোপান বাসনাটির কথা বলে একদিন।

ফখরে আলম বলে, 'তয়, অত ভাবাভাবির কী আছে চেয়ারম্যান হুজুর? চেয়ারম্যান সাবের খায়েশ হইয়েছে বাগানবাড়ি কইরতে, বাগানবাড়ি হইবে! নমুদের ওই শ্মশানের মাঝখানেই হইবে।'

চমকে চোখ তোলে কাশেম। ত্বরিত জিজ্ঞেস করে, 'হইবে তো বুইঝলাম, কিন্তুক ক্যামনে হইবে! মালাউনদের পুস্তপুরুষের শ্মশান! কইলেই কি ওরা ছেইড়ে দেবে?'

'সে আমার উপর ছাইড়া দ্যান হুজুর। আপনি শুধু আমার কথামতো কাজ কইরবেন। দেইখবেন, চোখের পলকে শ্মশানটি আপনার হইয়ে গেছে।'

এরপর দুজনে মুখোমুখি বসে। চাপা স্বরে বহুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে।

একদিন কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয় আবুল কাশেম। সঙ্গে সাঙ্গাতরা। কুমোরদের ডেকে বলে, 'দ্যাখ নমুর পো-রা, ওই জায়গাডা আমার খুব পছন্দ হইছে।'

কুমোরপাড়ার সুধাংশু সাহস করে জিজ্ঞেস করে, 'কোন জায়গাডা হুজুর?'

সুধাংশুর জিজ্ঞাসা আবুল কাশেম কানে তোলে না। বলে, 'ওইখানে আমি একখান এবাদতখানা বানাইমু।'

সমবেত কুমোররা চুপ করে থাকে।

কাশেম বলতে থাকে, 'মানুষ পোড়াইবার জইন্য তো অত বড় জায়গা লাগে না! আমি তোমাগো জইন্য একটা নতুন শ্মশানখানা গইড়ে দিতাছি।'

এবার কুমোরদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আবুল কাশেম তাদের শ্মশানটির কথা বলছে। তারা এও বোঝে- তাদের শ্মশানটি গিলে খাবার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবুল কাশেম। বুঝলে কী হবে, আবুল কাশেমের মুখের ওপর কথা বলবার সাহস নাই কারও। অজয় জেঠা, সুনীল, নন্দলাল, দুলাল, সুধাংশুরা চুপ করে থাকে।

আবুল কাশেম আশ্বাস দেয়, 'দেওয়াল কইরে দিমু চাইরদিকে। বর্তমানের চাইতে অনেক বড় হইবে নয়া শ্মশানটি। কাছে নদী তো থাইকবই।'

একটু থেমে কাশেম জিজ্ঞেস করে, 'কী বলো কুমোরের পুতরা? রাজি তো তোমরা?'

তার পরও অজয় জেঠা, সুধাংশুরা নীরব থাকে। ওরাই কুমোরপাড়ার মাথা।

মাথাদের মাথা হেঁট দেখে আবুল কাশেমের জোশ বেড়ে যায়। সোৎসাহে বলে, 'চুপ থাইকো না তোমরা। ভাবাভাবির দরকার নাই। যা কইলাম, মাইনা নেও, রাজি হইয়া গেলে আখেরে তোমাগোর লাভ। কথা দিতাছি, লাভ ছাড়া লোকসান অইব না তোমাগো।'

হঠাৎ ভিড় ঠেলে কুন্তী সামনে এগিয়ে আসে। সামান্য ঘোমটা টেনে বলে, 'একী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব! পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাগোর। আমাগোর বাপ-দাদা, তাগোর মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়াইয়া আছে অই শ্মশানের লগে! আপনি কী কইরে বলেন অই শ্মশান ছেইড়ে দিতে!'

আবুল কাশেম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। স্তম্ভিত চোখে সে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে ভাবেনি, কুমোরপাড়ার কেউ তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে। কেউ, বিশেষ করে কোনো নারী তার কথার প্রতিবাদ করবে, মোটেই আশা করেনি আবুল কাশেম। চোখের কোনা জ্বলে উঠে কাশেমের। তবে তা সামান্য সময়ের জন্য। নিজেকে সামলে নেয় দ্রুত। শান্ত চোখে পাশে দাঁড়ানো ফখরে আলমের দিকে তাকায়। ফখরে আলমের মোটা মাথা নয়। ভীষণ বুদ্ধি রাখে সে। বড় বড় সংকটে এই ফখরে আলমের বুদ্ধির ওপর ভর করে পার পেয়ে গেছে আবুল কাশেম। ফখরে আলম যেন মহাভারতের শকুনি। শকুনি যেমন সর্বদা দুর্যোধনের পাশে পাশে থেকে কুবুদ্ধি জোগাত, ফখরে আলমও কাশেমের সঙ্গে সঙ্গে থেকে বুদ্ধি আর কুবুদ্ধি জোগায়। ফখরে আলম চোখ ইশারায় চেয়ারম্যানকে চুপ থাকতে বলে।

তারপর চাপা গলায় বলে, 'কুমোরপাড়ার ভীষ্মের বউ কুন্তী হুজুর।'

তার পর কণ্ঠকে আরও খাদে নামিয়ে ফখরে আলম বলে, 'কুমোরপাড়ার হুরি হুজুর। লাল গোলাপ। মধুভরা চামেলি। বাইচ্চাকাইচ্চা হইলে কী অইবে, দেইখতে কচি ডাব হুজুর। পাকা তরমুজের মতো টং টং আওয়াজ দ্যায়।'

এরপর গলাকে উঁচুতে তুলে বলে, 'এই পাড়ার কুমোররা কুন্তীরে খুউব মান দ্যায় হুজুর।'

যা বোঝার, ফখরে আলমের কথায় বুঝে গেল আবুল কাশেম। বুঝে গেল যে কুন্তীর সঙ্গে সমঝে কথা বলতে হবে, বুঝে গেল যে জনসমক্ষে কুন্তীকে অপমানজনক কথা বলা যাবে না। কাশেমের আরও বুঝতে অসুবিধা হলো না যে কুন্তীর কথার বিশেষ গুরুত্ব আছে এই চাঁপাতলার কুমোরপাড়ায়।

কণ্ঠে মধু ঢেলে আবুল কাশেম বলল, 'দ্যাখ বেটি, যদিও পুরুষ থাইকতে মাইয়া মাইনষের লগে কথা কওন আমি পছন্দ করি না, তারপরও শুইনলাম, এই পাড়ার কুমোররা তোমারে মাইন্যগইন্য করে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। তাগোর শ্রদ্ধায় আস্থা আছে আমার।'

আমার কথাখান বিশ্বাস কর তোমরা। যা কইলাম, তা-ই কইরে দিব আমি। একেবারে তকতইক্যা ঝকঝইক্যা একখান শ্মশানখানা গইড়ে দিমু।' এরপর দৃষ্টি সমবেত কুমোরদের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কাশেম বলল, 'তোমাগো সকলের প্রতি গভীর একখান ভালোবাসা আছে আমার বুকের মইধ্যে। তোমাগো আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেইকে সম্মান করি। হেই সম্মানের জায়গা থেইকে কইতাছি কণ্ঠে গাঢ় সহানুভূতি মিশিয়ে আবুল কাশেম আবার বলল, 'এই শ্মশানডা অতি জংলা। সাপখোপের আস্তানা। এখানে ওখানে জল-জলা। একপাশে নদীভাঙন। কুনসময় তোমাগো শ্মশানডা কাঁকারির পানিতে তলাইয়া যায়! তাই কইতাছি, আমার প্রস্তাবডারে হেলা দেখাইও না তোমরা। মাইনা লও। শেষ পর্যন্ত তোমাগোরই মঙ্গল অইব।'

চেয়ারম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কুন্তী বলে উঠল, 'দরকার নাই আমাগোর বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের এই শ্মশানডা আমাগো মাথার উপর থাউক। আমাগো শ্মশানের দিকে কুনজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাব।'

চব্বিশ

বিস্ময়ে চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের।

আবুল কাশেম নিরেট পাথর যেন। স্তব্ধ। নিস্পন্দ। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছে সে। অনেকক্ষণ পরে তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। চোখের পলক পড়ে। কিন্তু বিস্ময় কাটে না। কুমোরপাড়ার একজন সামান্য নারী তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে! তার মুখে মুখে তর্ক করছে! এ বেটি এত সাহস পেল কোত্থেকে!

দ্রুত নিজেকে সংযত করে আবুল কাশেম। অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলে, 'তুমি কী কইতে চাও মাইয়া! বুইঝতে পাইরতাছি না! কীসের কুনজরের কথা বইলতাছ তুমি!'

শান্তনু বলে উঠে, 'কুন্তী মাসি ঠিকই তো কইছে চেয়ারম্যান সাব! আপনার প্রস্তাবডার মইধ্যে ভেজাল আছে, লোভ আছে।' চেয়ারম্যান আসার সংবাদ পেয়ে দ্রুত কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয়েছে শান্তনু।

এবার ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে কাশেম বলে উঠল, 'আরে ডোমের পোলাও তো আইয়া জুইটছে দেখি! কুমোরগো লগে জাইল্যাদের মিল অইল কখন? আরে সুখেন্দুর ছাওয়াল, তুই আবার কুমোরপাড়ার লিডার হইয়া উঠলি কবে!' কাশেমের বলার ভঙ্গিটা ঠাট্টার হলেও চোখ দিয়ে তার আগুন ঝরছে।

'শান্তনুরে ধমকাইয়েন না হুজুর। হে তো হাঁচা কথাই কইছে। আপনি তো ভড়ং ধইরেছেন। শ্মশানের মাডি আত্মসাৎ করার ভড়ং। এবাদতখানার কথা বইলে শ্মশানের জমি নিজের কইরা লইতে চান।' গড় গড় করে বলে গেল কুন্তী।

আবুল কাশেমের দাঁত কড় কড় করে উঠল। ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু একটা বলতে উদ্যত হলো। পাশ থেকে পাঞ্জাবির কোনা টেনে ধরল ফখরে আলম। চাপাস্বরে বলল, 'সাবধান হুজুর, মাথা গরম কইরেন না। যা কইরবেন মাথা ঠান্ডা রেইখে কইরবেন। যা বইলবেন, মুখে হাসি রেইখে বইলবেন।'

শ্মশানডা তিনি গিল্লা খাইতে চান। তা হুজুর আপনি কি আমাগো বইলবেন, ওইখানে যত দামি গাছ আছে, গাছগুলার দাম কত অইব?' সুধাংশু এবার আস্তে আস্তে বলল, 'চেয়ারম্যান সাব আর কী বইলবেন! যা বলার তো আগেই বইলে দিছেন

কুন্তী বলে উঠল, 'আমাগো শ্মশানে কত বিঘা জাগা আছে কইতে পারেন হুজুর! অই ভূমির অহন বাজারমূল্য কত?'

সুনীল বলল, 'আমাগো যতই বোকা ভাবেন হুজুর, অত বোকা না আমরা। আমরাও চাল-ডাল কিনি। সংসার করি।'

একটু পিছন থেকে দুলাল চাপা কণ্ঠে বলল, 'লোভ ছাড়েন। গরিবের শেষ ঠিকানার জাগাটা খাইড়া লইয়েন না চেয়ারম্যান সাব।'

পর পর এতজনের মন্তব্যে আবুল কাশেমের মাথাটা আউলা-ঝাউলা হয়ে যাবার উপক্রম হলো। হলোও তা-ই। এত বছর চেয়ারম্যানি করছে কাশেম, এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি কখনো। কত মাস্তানকে পিটিয়ে সোজা করেছে, কত বেয়াদবের দাঁত উপড়ে নিয়েছে! আজ এই সামান্য কজন নমুজাতের মানুষের সামনে নাজেহাল হতে হচ্ছে তাকে! এত নির্জীব মানুষেরা যে এরকম প্রতিবাদী হয়ে উঠবে, স্বপ্নেও ভাবেনি কাশেম। ইচ্ছে করলে এখনই যারা চেটাং চেটাং করছে, তাদেরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে সে। কিন্তু এই মুহূর্তে তা করা ঠিক হবে না। তার হাতের অস্ত্র তো এখনো শেষ হয়ে যায়নি! সবেমাত্র একটি তীর ছুড়েছে সে। তার তূণভরতি আরও বহু তীর।

যা কইরবেন, মাথা ঠান্ডা রেইখে কইরবেন। হঠাৎ ফখরে আলমের কথা মনে পড়ে যায় আবুল কাশেমের

মুখে হাসি ছড়িয়ে আবুল কাশেম বলল, 'তোমাগোর কথা আমি কিছুই বুইঝতে পাইরতাছি না। তোমরা যে এতগুলা কথা বইলতেছ, এখানে আমার ভূমি আত্মসাৎ করার ফন্দিটা কোথায় খুঁইজে পাইলা! কও তো কুমোর পো-রা!'

এই সময়ে কুমোরদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সুধাংশুদা, কুন্তী মাসি ঠিকই কইছে। সুনীল কাকার কথাই ঠিক। আমরা অত বেকুব না। অই ভূমির দাম যে অহন কোটি কোটি টাকা, তা পাগলও কইয়া দিতে পারে।'

ফখরে আলম বলল, 'কী অজয় বুড়া, তোমাগো পাড়ার এই অবুঝরা যে আবোল-তাবোল কথা কইতেছে, শুইনতে পাইছ্ছ না? আর ওই ভীষ্মর বউখান আমাগো সম্মানিত চেয়ারম্যান সাবের লগে যে বিয়াদবি কইরতাছে, তার বেলা কিছু কইতাছ না যে!'

অজয় জেঠা লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। স্পষ্ট গলায় বলে, 'মানুষের কাছ থেইকে সম্মান পাইতে হইলে সম্মান দিতে হয়। অল্প বয়সের এই যে তুমি আমারে অজয় বুড়া বইল্লা, এইডা কি আমারে সম্মান কইরল্লা? আর কুন্তীর কথা কইলা না? কুন্তী কোন কথাডা মিথ্যা কইছে, কইবা আমারে! চেয়ারম্যান সাবের উদ্দেশ্য তো ভালা না।'

এর পর অজয় জেঠা চেয়ারম্যানের দিকে মুখ ঘোরায়। বলে, 'আর হুনেন হুজুর, কুন্তী এই কুমোরপাড়ার এলনাফেলনা কেউ না। এই পাড়ায় তার গুরুত্ব আছে। তার কথার দাম আছে আমাগো কাছে। আর যে যা কইছে, আমাগো সবার মনের কথাই কইছে। এই শ্মশান আপনি দখল কইরতে পাইরবেন না।'

বলে হাঁপাতে শুরু করল জেঠা। সুধাংশু তাকে ধরে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিল।

ফখরে আলম ফিসফিসিয়ে বলল, 'খবরদার হুজুর! মাথা বরফের মতো ঠান্ডা! সামনে ইলেকশন! নমুদের ভোট খুবই মূল্যবান। সব হাসিল কইরব। তবে তা ধীরে। আপনার বলার আর কিছু থাইকলে বলেন, কিন্তু মাথা গরম না কইরে বলেন।'

ভোটের সময় নমুদের ভোট যাতে হাতছাড়া না হয়। মালো-কুমোর-নাপিত-বৌদ্ধ সবার ভোট যাতে তাঁর বাক্সে পড়ে। এমপি তার শক্ত খুঁটি। খুঁটির জোরে যেমন ছাগল লাফায়, সেও এমপির শক্তিতে এই চেঙ্গুটিয়ায় রাজত্ব করে। আবুল কাশেম ফখরে আলমের পরামর্শ মেনে নিল। এই এলাকার এমপি সাহেব তাকে বলেছেন

মিষ্টি হেসে আবুল কাশেম বলে, 'তোমাগো পাল্‌স বুঝি আমি। দ্যাখ মানুষ সবসময় নিজের ভালাটা চায়। তোমরা চাইতাছ না ক্যান বুইঝতে পাইরতাছি না! একটা খারাপরে ত্যাগ কইরে একটা খুব ভালাকে মেইনে লইতে তোমাগো আপিত্তি ক্যান বুইঝলাম না!'

কুন্তী বলল, 'আমাগো অত ভালার দরকার নাই। যে খারাপ শ্মশানডা আছে, হেইডা আমাগো হইয়ে থাইকলেই অইল।'

'এই তুমি মাইয়া, এতগুলা পুরুষ থাইকতে তুমি ক্যান মাঝখানে মাঝখানে নাক গলাইতাছে বুইঝতে পাইরতাছি না!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল আবুল কাশেম।

শান্তনু বলল, 'ওকে ধমকাইয়েন না চেয়ারম্যান সাব।'

আবুল কাশেম বলল, 'শোন মালোর পুত, আর তোমরাও শোনো কুমোরের পো-রা, যতই হই চই কর, তোমাগো হাঁড়ির খবর আমি জানি। এই যে বছরের পর বছর ধইরে চাঁপাতলায় বসবাস কইরতেছ, বাস্তুভিটার দলিল-দস্তাবেজ আছেনি তোমাগো কাছে? নাই। শ্মশানের দলিলের কথা নাই-বা কইলাম।'

তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল আবুল কাশেম।

কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'অই ভূমি আমার। আমার বাবায় একসময় জমিদার বিমলেন্দু রায়চৌধুরীর কাছ থেইকা শ্মশানের জাগাডা কিন্যা নিছিল। দলিল আছে আমার কাছে।'

সমবেতদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। আবুল কাশেম আগের মতো শক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাগো চাইর মাস সময় দিয়া গেলাম। আর হ্যাঁ, আইজ থেইকা অইখানে আর মড়া পোড়াইবে না।'

কথা শেষ করেই পেছন ফিরল আবুল কাশেম।

কাশেমের পেছনে ফখরে আলম।

তার পেছনে চেলাসাঙ্গাতরা।

চেয়ারম্যান সাবের বাপ নাকি শ্যামসুন্দরবাবুর জমিতে কামলাগিরি কইরত। দিন আনি দিন খাওনর পইসা আছিল না নাকি তার!' দল থেকে দুকদম এগিয়ে এসে তৌহিদ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ফখরে ভাই, এই যে চেয়ারম্যান সাব কইলেন, তাঁর বাবা জমিদারবাবুত্তোন শ্মশানখানা কিন্যা নিছেন। কথাডা সত্য নাকি! বাপের কাছে হুনছি 'চোপরাও পুঙ্গির পুত। আর একখান কথা কইছস তো জিভডা টাইন্যা বাইর কইরে লমু হারামির বাইচ্চা। চেয়ারম্যান সাবের বাপ যদি জাগাখান না-ও কিনেন, কিনতে কতক্ষণ রে হারামজাদা! দ্যাশ আমাগো। সামনের ইলেকশনে আমাগো দলই আবার ক্ষেমতায় আইব। অই শ্মশানের দলিল বানাইতে কত সময় লাইগব রে হালারপুত!' চাপা গর্জনে ফেটে পড়ল ফখরে আলম।

এই কথার মানে কী! চেয়ারম্যান সাহেব যে-দল করেন, সে-দল তো এখন ক্ষমতায় আছেই! তাহলে কোন দলকে 'আমাগো দল' বলছে ফখরে আলম! চেয়ারম্যান সাহেব জোর যার মুলুক তার। কিন্তু শেষের কথার অর্থটা ধরতে পারছে না তৌহিদ। আমাগো দলই আবার ক্ষেমতায় আইব তৌহিদ মুখ কাঁচুমাচু করে চুপ মেরে গেল। ফখরে আলমের কথার প্রথমাংশের মানে সে বুঝে ফেলেছে তাহলে বর্তমান দলের সমর্থক নন! মনে মনে অন্য একটা দলকে সমর্থন করেন!

ফখরে আলমের গর্জন শুনে আবুল কাশেম হাঁটা থামিয়ে পেছন ফিরে। জিজ্ঞেস করে, 'কী হইছে ফখরে, এইরকম চিল্লাইয়া উইঠলা ক্যান?'

ফখরে আলম বলে ওঠে, 'ও কিছু না হুজুর। তৌহিদ্যার এলেম কম। হেরে একটু এলেম দিলাম হুজুর। গলাটা উঁচু হইয়ে গেছে একটু। মাফ কইরে দ্যান।'

আবুল কাশেম মুচকি হাসে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনের কথাই কানে গেছে তার। ফখরে আলমের ধমকানি শুনে দিল খুশ হয়ে গেছে তার। ফখরের উপস্থিত বুদ্ধি চমৎকার। এইজন্য ফখরে আলমকে খুব পছন্দ করে আবুল কাশেম।

শেষাংশ আগামী সপ্তাহে